Vol. 5 | No. 2 | 1961

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা

Volume	5
Issue	2
Year	1961
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবদুল হালীম
Published online	December 16, 1961
DOI	10.62328/sp.v5i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v5i2.7
Pages	3`13-324
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা : কাজী আবদুল মান্নান ॥ বাঙলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১ ॥ পৃ ৩৫৪+২০ ॥ দাম : দশ টাকা ॥

আলোচ্য বইটিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব কাজী আবদুল মান্নান উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের অবদানের স্বরূপনির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। বইটিতে সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান আছে যথেষ্ট, তবে লেখকের প্রধান লক্ষ্য সমাজিক পটভূমিতে এই সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণ করা এবং সাহিত্যে প্রতিফলিত চিন্তাধারার পরিচয় দেওয়া। তাই ইতিহাসের আকারে বা বিভিন্ন লেখকের রচনাবলীর ধারাবাহিক আলোচনারূপে এটি রচিত হয় নি। বইটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত : "পটভূমি", "মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক প্রয়াস (১৮৬৪-১৮৯৯)", "মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ সাহিত্যিক প্রয়াস (১৮৯৯-১৯১৭)" এবং "জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি (১৯০১-১৯১৮)"। প্রত্যেকটি অধ্যায়ই স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসেবে রচিত বলে মনে হয়। তবে প্রথমটিতে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পশ্চাদভূমি এবং পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে ১৮৬৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত মুসলমান লেখকদের সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে।

বইটির সামগ্রিকতা সত্ত্বেও অধ্যায়গুলোকে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ বলে আখ্যায়িত করছি কেন, এর একটা কৈফিয়ত দেওয়া দরকার। এর প্রধান কারণ এই যে, বইটির কোথাও লেখক তাঁর অধ্যায়বিভাগের কোন কারণ দর্শান নি। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দকে কি কারণে তিনি বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক প্রয়াসের অবসানকাল বলে গণ্য করেছেন, একথা আমাদেরকে যেমন বুঝিয়ে বলেন নি, তেমনি, ১৮৮৯ থেকে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সূত্রপাত হল কেন এবং কি করে, তাও আমরা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পারি না। অনুমান করা যায়, বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ-প্রকাশকে

তিনি বিক্ষিপ্ত প্রয়াস এবং পত্রিকা-প্রকাশকে সংঘবদ্ধ প্রয়াস বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু তবু কথা রয়ে যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের আগে প্রচারিত অন্ততঃ দুটি পত্রিকার উল্লেখ তিনি করেছেন—'আক্সীজন্‌নেহার' এবং 'আখবারে এসলামিয়া'। আবার, ঐ একই অধ্যায়ে চারজন লেখকের মিলিত রচনার—'এসলাম তত্ত্বে'র—আলোচনাও তিনি করেছেন। কাজেই ঐ তারিখ এবং সংঘবদ্ধতা সম্পর্কে আরেকটু স্পষ্টভাষী হওয়া তাঁর পক্ষে আবশ্যক ছিল। তাছাড়া, বইকে 'বিক্ষিপ্ত' এবং পত্রিকাকে 'সংঘবদ্ধ'রূপে শ্রেণীকরণ করাও কি খুব নিরাপদ? একই লোক যখন পুস্তকপ্রকাশ করছেন, তখন সেটা তাঁর বিক্ষিপ্ত প্রয়াস আর তিনিই যখন আবার পত্রিকা প্রকাশ করছেন, তখন সেটা তাঁর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা—এ কথা কখনো কখনো বিভ্রান্তিকর হতে পারে—যদি লেখক গোড়ায় এসব শ্রেণীকরণের হেতুবাদ বিবৃত না করেন।

বইয়ের অধ্যায়গুলোকে বিচ্ছিন্ন বলার আরেকটা কারণ এই যে, ১৮৮৮র পর মুসলমান লেখকদের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত গদ্যরচনা তিনি বিশেষ আলোচনা করেন নি।

তৃতীয়তঃ, তাঁর প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়সমূহের যোগও যথেষ্ট পরিমাণে গভীর নয়, যদিও সবকটি অধ্যায়ই সুলিখিত এবং লেখকের গভীর শ্রম ও বিশ্লেষণক্ষমতার পরিচায়ক।

দুই

বইয়ের প্রথম ৬৭ পৃষ্ঠা এবং তার আনুষঙ্গিক ১৬ পৃষ্ঠা পাদটীকা—মোট ৮৩ পৃষ্ঠা ধরে লেখক সামাজিক পটভূমির পরিচয় দিয়েছেন। এই পরিসরে দেড় শ' বছরের "রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা [গত] ও সাংস্কৃতিক" পটভূমির পরিচয়দান নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ। সেই দুরূহ কাজ তিনি সম্পাদন করেছেন সফলভাবে এবং তার জন্যে সেরকম দুরূহ ক্ষেত্র থেকেই তিনি মালমশলা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর বর্ণিত তথ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জাগে না। এই তথ্যের আলোকে তিনি যেসব ব্যাখ্যাদান ও সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছেন, সেগুলো তাঁর নিজস্ব। তাঁর ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে সর্বত্র একমত হতে না পারলেও ক্ষতি নেই—এই আলোচনায় তিনি যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের প্রশংসা দাবী করে।

এই ধরনের আলোচনায় কোথাও কোথাও অনবধানতাজনিত ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক এবং সেক্ষেত্রে সমালোচকের দায়িত্ব এ বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যেমন, বইয়ের সূচনায় তিনি যে বলেছেন,

> পাক-ভারত উপমহাদেশে সামন্ততন্ত্রের স্বর্ণযুগে যে নতুন ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল, তার প্রাথমিক আশ্রয় ছিল কৃপা এবং করুণা ; কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল সম্পৎ এবং সমৃদ্ধি। [পৃ ২]

আমার বিশ্বাস, পাক-ভারতে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছিল, একথা বলা তাঁর অভিপ্রায় নয়। তিনি হয়তো বলতে চান, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দেশ থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের কথা। তবে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল ইউরোপীয় বণিক ভারতবর্ষে বাণিজ্য-ব্যপদেশে এসেছিলেন, তাঁরা কিন্তু সকলেই ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে আসেন নি।

অনুরূপ, তিনি যখন বলেন ঃ

> অষ্টাদশ শতকে 'রেশনালিজম' মতবাদ সারা ইউরোপে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং ফরাসী দেশে বিপ্লব ঘটিয়েছিল······ [পৃ ১১]

তখনও মনে হয়, অংশকেই তিনি সমগ্র হিসেবে দেখেছেন।

বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার সম্পর্ক প্রসঙ্গে লেখক যেসব উক্তি করেছেন, তার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব আছে। প্রথমে তিনি বলেছেন ঃ

> ইংরেজী শিক্ষার গরজও তাদের মধ্যে জাগে নি ; [পৃ ৩৯]

তারপর এর সমর্থনে ঃ

> শুধু যে নতুন (ইংরেজী) শিক্ষার ব্যাপারেই তাঁদের উৎসাহের অভাব ছিল তাই নয়…, [পৃ ৪০]

কিন্তু পরে ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিকের থিসিসের উপাদান ব্যবহার করতে করতে পূর্বভাষণ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তিনি বলেছেন :

> মুসলমানরা আদৌ ইংরেজী পড়তে চায় না বলে যে ঢালা অভিযোগ করা হোত উপরোক্ত ঘটনা থেকে তা অনেকটা মিথ্যা প্রতিপন্ন

হয়। ·এমন কি, মফস্বলের মুসলমানদের মধ্যেও ইংরেজী-শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ দেখা যায়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার বিশপ হেবারের কাছে মুসলমানরা ইংরেজী পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং স্কুল খোলার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানায়।···

কোলকাতা শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলমানদের দৃষ্টি অনেকটা বাস্তব ছিল। ইংরেজী-শিক্ষার ব্যাপারে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের চেয়ে তারাই বেশী আগ্রহশীল ছিল। [পৃ ৪৯]

ডক্টর মল্লিকের থিসিস থেকে এরকম আরো অনেক প্রমাণ তিনি উদ্ধৃত করেছেন। তাহলে মান্নান সাহেব কি করে বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার গরজই জাগে নি ? আসলে লেখকের প্রথম উক্তিগুলো ধারণাপ্রসূত—বাস্তব তথ্যসম্ভূত নয়। এই পূর্বধারণার হাত এড়াতে পারেন নি তিনি, আবার ডক্টর মল্লিক যেসব প্রমাণাদি উপস্থিত করেছেন, তাও উপেক্ষা করতে পারেন নি। একটু সচেতন হলে তিনি হয়তো এই বিরোধিতা এড়াতে পারতেন।

হিন্দী চলচ্চিত্রের সঙ্গে বটতলার পুঁথির যে তুলনা তিনি করেছেন [পৃ ৬৬] এই ধরনের গবেষণামূলক বইতে তা শোভন হয় নি।

এই অধ্যায়ের শেষে যে সমৃদ্ধ প্রমাণপঞ্জী যুক্ত হয়েছে, সে সম্পর্কে একটি কথা বলার আছে। লেখক কোথাও কোথাও [২১ ও ২২ টীকা] বইয়ের নাম করেছেন মাত্র, সেসব বইয়ের রচয়িতার নামোল্লেখ বা প্রকাশসংক্রান্ত তথ্য বা পৃষ্ঠানির্দেশ—এসব কিছুই করেন নি। আবার কোথাও [২, ৩ ও ৫২ টীকা] লেখকের ও বইয়ের নাম আছে, বাদবাকী কিছু নেই। কোথাও আবার হয় প্রকাশসংক্রান্ত তথ্য, নয় পৃষ্ঠাসংখ্যা আছে, দুইয়ের একত্র উপস্থিতি নেই। গবেষণামূলক বইতে প্রমাণের অসম্পূর্ণ উল্লেখ একেবারেই অচল।

কয়েকটি বানান বা উচ্চারণও বিসদৃশ। যেমন, 'চোয়াড়' 'ফরায়িজী' [পৃ ৭], 'খমাস' [৯] 'ইলারটন' [১0], 'চিনসুরা' [১০]।

ভাষারও কিছু অসঙ্গতি আছে। যথা :

(১) ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে The Society for Promoting Christian Knowledge নামে একটি সমিতি কোলকাতায় আসে···। [পৃ ৮]

(১) তাঁরা [মিশনারীরা] যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেন সেগুলো এ দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। [পৃ ১২]

(৩) অবশ্য এর সূচনা রামমোহন রায় আমহার্স্টকে লিখিত পত্রেই করেছিলেন। [পৃ ১৫]

এই অধ্যায়ের মতো অন্যান্য অধ্যায়ের শেষেও প্রমাণপঞ্জী থাকা উচিত ছিল।

তিন

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক প্রয়াসের আলোচনা করেছেন। গোলাম হোসেনের 'হাড়জ্বালানী'তে (কলিকাতা, ১২৭১) এই আলোচনার শুরু এবং সেখ আবদোস সোবহানের 'হিন্দু মোসলমানে' (কলিকাতা, ১৮৮৮) এর সমাপ্তি। এর মধ্যে অনেকগুলো বইয়ের বিস্তৃত পরিচয়ই আলোচ্য গ্রন্থে প্রথম সন্নিবেশিত হল ঃ যেমন, 'হাড়জ্বালানী' 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' ও 'রত্নবতী'। এদিক দিয়ে লেখক আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের অন্ধকার কোণে নতুন আলোকপাত করেছেন।

হয়তো এসব বইয়ের পরিচয় প্রথম দিচ্ছেন বলে, এগুলোর প্রয়োজনাতিরিক্ত আলোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে তিনি মাঝে মাঝে এমন উক্তি করে ফেলেছেন, যা সব সময়ে সত্য নয়। যেমন, খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী-রচিত 'উচিত শ্রবণ' (কলিকাতা, ১৮৬০) সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ

> পুস্তকটির বিষয়বস্তু পরমার্থিক। এতে সাধুরীতিতে লিখিত কিছু গদ্যের নিদর্শন আছে। ধর্মের গূঢ় রহস্য বোঝাতে গিয়ে লেখক এর ভাষাকে জটিল এবং আড়ষ্ট করে ফেলেছেন। [পৃ ৮৮]

বইটি তিনি দেখেছেন ব'লে মনে হয় না। দেখলে তিনি উল্লেখ করতে পারতেন যে, বইটিতে যোগশাস্ত্রের আলোচনাই প্রধান এবং এর ভাষা কোথাও জটিল হয়ে থাকলে, তার জন্যে দায়ী লেখকের অনুপ্রাস-প্রবণতা এবং যোগের পারিভাষিক শব্দের প্রাচুর্য—ধর্মের গূঢ় রহস্য বোঝাবার প্রয়াস নয়। তিনি হয়তো, আরো

বলতে পারতেন যে, মাঝে মাঝে বইটির ভাষা—কী গদ্য, কী পদ্য—অত্যন্ত সুললিত, মার্জিত, সুন্দর। এর প্রকাশকাল সম্পর্কে তাঁর মনে যে প্রশ্ন জেগেছে তারও অপনোদন হত যদি তিনি অন্ততঃ বৃটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থতালিকা দেখতেন!

তিনি বলেছেন:

> সমাজে টাকার প্রতাপ সেদিনের সাহিত্যিকদের মনে জাগিয়ে ছিল বিস্ময় এবং বেদনা। টাকাওয়ালা অর্থাৎ বিত্তবান বৃদ্ধের তরুণী বিবাহের বিড়ম্বিত পরিণতি এ সময়ের বহু নাটক ও প্রহসনে পাওয়া যায়। মাইকেল মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা' (১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ), দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দ) প্রভৃতি প্রহসন উপরোক্ত বিষয় অবলম্বনেই রচিত। [পৃ ১০০]

উল্লিখিত প্রহসন দুটিতে "তরুণী বিবাহের বিড়ম্বিত পরিণতি" দেখা যায়—এ মন্তব্য কিন্তু সত্য নয়।

মীর মশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী' (কলিকাতা, ১৮৬৯) সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যও সন্দেহাতীত নয়। তিনি বলেছেন:

> ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী'কে নিয়েই আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকদের উপন্যাস এবং গল্পরচনার সূত্রপাত হয়। [পৃ ১০২]

কিন্তু 'রত্নবতী' আধুনিক নয়, উপন্যাস নয়, গল্পও নয়। লেখক নিজেও তা জানেন:

> আধুনিক উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি 'রত্নবতী' তা নয়। এতে রূপকথার কাহিনী জাতীয় একটি গল্প বলা হয়েছে।···কাজেই 'রত্নবতী'কে দিয়েই এ-কালের মুসলমান সাহিত্যিকদের গল্পরচনার সূত্রপাত হয়েছে বলা যায়। [পৃ ১০৮-১০৯]

তাহলে প্রস্তাবের 'উপন্যাস' কথাটি বাক্যের অলংকার হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, বলতে হবে। আর উপসংহারের 'গল্প' কথাটা রূপকথার সমার্থক হয়ে উঠেছে। অনুরূপ, নীচের মন্তব্যের মধ্যেও পরস্পরবিরোধিতার অবকাশ আছে:

> মশাররফ হোসেন…তাঁর প্রথম রচনাটিকে মৌলিক কল্পনায় দাঁড় করাতে চেয়েছেন।…ফলে, দেশে প্রচলিত কাহিনীকেই আশ্রয় করেই 'রত্নবতী'র গল্প সৃষ্টি হয়েছে। [১০৮]

প্রচলিত কাহিনীর কী মৌলিক রূপান্তর মশাররফ হোসেন সাধন করেছেন, সে কথা কিন্তু কোথাও বিশ্বাসযোগ্যরূপে তিনি ব্যাখ্যা করেন নি।

সাহিত্যের এই আলোচনার মধ্যে কোন কোন বইয়ের উল্লেখ, আমার ধারণায়, বে-মানান হয়েছে। শ্রীমির আসরফ আলীর 'বালচিকিৎসা' (কলিকাতা, ১৮৭০) মুসলমানদের রচিত প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ (পৃ ১১৭) বলে অভিহিত করে তার গদ্যরীতির আলোচনা নিতান্তই বাহুল্য হয়েছে। অনুরূপভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে, 'মিহির' ও 'ইসলাম প্রচারের' সমালোচনা কলাম থেকে শ্রীআবিদ আলী খাঁর 'মৌখিক অঙ্ক' (পৃ ২০৫) ও 'মানসাঙ্ক ও শুভঙ্করী' (পৃ ২২৮) পুস্তকের পরিচয়দান—আর যাই করুক—সমসাময়িক সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করে না।

চার

আটান্ন পৃষ্ঠাব্যাপী দ্বিতীয় অধ্যায়ের পর ১৬৯ পৃষ্ঠা ধরে মুসলমানদের পত্রপত্রিকা সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেছেন, সেটাই এই বইয়ের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও সুলিখিত অংশ। বিশেষ করে, 'ইসলাম-প্রচারক', 'মিহির' ও 'আল-এসলামে' প্রকাশিত রচনাদির যে শ্রেণীকরণ তিনি করেছেন, তা খুবই প্রশংসনীয়। বহু দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার—'মিহির', 'হাফেজ', 'লহরী', 'নুরঅল ইমান', 'বাসনা' প্রভৃতির—বিস্তৃত আলোচনায় প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ। উৎসাহী পাঠকের জন্যে এই অধায় বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হবে।

পত্রিকাগুলোর আলোচনায় আগাগোড়া ধারাবাহিকতা রক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু 'কোহিনুরে'র (১৮৯৮) পর 'হিতকরী'র (১৮৯০) আলোচনা [পৃ ২৭০] সংযোজিত হওয়ায় ধারাবাহিকতার ব্যত্যয় ঘটেছে।

দুটি পত্রিকার প্রথম প্রকাশের কাল-উল্লেখ ভুল হয়েছে। 'আখবারে এসলামীয়া' ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয়—১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নয়। 'হাফেজ' ১৮৯২তে নয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য এটা মুদ্রণজনিত প্রমাদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আরেকটি কথা। 'আহমদী'তে প্রকাশিত 'গোকুল নির্মূল আশংকা" নামক প্রবন্ধের রচয়িতা যে মীর মশাররফ হোসেন এবং প্রবন্ধটি যে তাঁর 'গো-জীবন' পুস্তিকার অংশবিশেষ, একথা যথাস্থানে [পৃ ১৪৮ ও পৃ ১৫২] বলা উচিত ছিল।

পাঁচ

সর্বশেষে, চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা— মুসলমান কবিদের রচিত জাতীয় আখ্যান-কাব্য সম্পর্কে। এখানেও তিনি অনেক বিস্মৃত ও স্বল্পালোচিত কাব্যের বিচার-বিশ্লেষণ করে অনেক অপরিজ্ঞাত তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন।

তবে এ পর্যায়ে কিছু প্রয়োজনাতারিক্ত বাগ্‌বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। "মধ্যযুগীয় বিজয় ও মঙ্গল কাব্যগুলোর মধ্যে" "যুগচিন্তার ক্ষীণ প্রতিফলনে"র তুলনায় আধুনিক কাব্যসমূহের সাধারণ প্রশংসা প্রয়োজনীয় ছিল না। মধুসূদন-সম্পর্কিত সর্বস্বীকৃত মতামত ও প্রচলিত মন্তব্যের পুনরাবৃত্তির কোন আবশ্যকতা ছিল না, যেমন, দুরকম এপিকের সংজ্ঞাবিশ্লেষণও তাঁর অবশ্যকর্তব্য ছিল না। তার উপরে, রবীন্দ্রনাথের "ভাষা ও ছন্দ" কবিতার সেই অতি-উদ্ধৃত চরণদ্বয় পুনরুদ্ধার করে যে মন্তব্য তিনি সংযোজন করেছেন—"রামায়ণের রাম অযোধ্যার নয়, জাতিরই মানসপুত্র"— তাও বাহুল্য মাত্র।

আবার, তাঁর নতুন কথাও সব সময়ে উপাদেয় হয় নি। যেমন,

> বিদেশী শাসকের 'সুচিন্তিত পরিকল্পনা' রূপায়ণে সাহায্য ক'রে
> রঙ্গলাল হয়ত লাভবান হয়েছেন ডেপুটিগিরি পেয়ে। [পৃ ৩২২]

'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্য ইংরেজের নীতির সহায় হতেও পারে, কিন্তু তার জন্যে ইংরেজ উদার হস্তে ডেপুটিগিরি দান করবেন, এই ধারণা লেখকের বিশ্বাসপ্রবণতারই পরিচায়ক।

এই প্রসঙ্গে লেখক যথার্থই দেখিয়েছেন যে, হিন্দু লেখকের আখ্যান-কাব্যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ও মুসলিম-বিদ্বেষ একই সঙ্গে প্রকাশলাভ করেছে। একথা মিথ্যা নয়। এরপর এদের সঙ্গে তুলনা করে মুসলমান কবিদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

> স্বাধীনতাসংগ্রামের যে বাণী তাঁরা শুনিয়েছেন, তার মধ্যে দ্বিধা নেই বা পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নেই। [পৃ ৩৪২]

এই মন্তব্য কিন্তু রঙ্গলালের ডেপুটিগিরি লাভের মতোই—অনেকখানি বিশ্বাসজাত, বাস্তব তথ্যপ্রণোদিত নয়। উনিশ শতকের শেষাংশের হিন্দু লেখকদের মতো মুসলমান লেখকেরাও একই সঙ্গে স্বাধীনতা-কামনা এবং ইংরেজের প্রশস্তিগান করেছেন। মীর মশাররফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় তার নমুনা মিলবে। লেখকের আলোচিত কাব্যকারদের মধ্যে থেকে দুটি উদাহরণ দিই। 'মহাশ্মশানে'র সুবিস্তৃত আলোচনা তিনি যখন করেছেন, তখন এই কাব্যের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কায়কোবাদের উক্তি—

> ভারতীয় মুসলমানদের উপরে জগদীশ্বরের অপার করুণা বলিয়াই ভারতে ইংরাজগণের আগমন হইয়াছিল। [পৃ ৷৴৹]

—নিশ্চয় তাঁর চোখে পড়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণ, ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'সঙ্গীত-সঞ্জীবনী'তে পাওয়া যাবে:

> দেহ দেহ জয় ওহে দয়াময়
> দেহ বৃটিশেরে অভয় আশ্রয়।

প্রসঙ্গত মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে সিরাজীর লেখা কবিতা "শোক-লহরী"র ('এসলাম প্রচারক', মে-জুন ১৯০০) প্রতিও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উভয় সম্প্রদায়ের কবিরা একই পরিমণ্ডলে বাস করতেন বলে এই আপাতবিরোধ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

মুসলমান কবিদের রচনায় হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্ক খুব মধুময়রূপে চিত্রিত হয়েছে—এটাও আমি স্বীকার করিনা। তা সম্ভবপরও ছিলনা—আবার পরিবেশের কারণ উল্লেখ করব। মোজাম্মেল হকের 'দরাফ খাঁ গাজী', সিরাজীর ঐতিহাসিক উপন্যাস, মতীয়র রহমানের 'গ্রন্থাবলী', নজীবর রহমানের 'হাসনগঙ্গা বাহমনি' প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। আখ্যান কাব্যের ক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেনের 'মদিনার গৌরব' (১৯০৬), 'মোশ্লেম বীরত্ব' (১৯০৮), 'বাজীমাৎ' (৬৯০৮) এবং সৈয়দ আবুল হোসেনের গ্রন্থাবলীর পাতা উল্টালেও আমার বক্তব্যের সমর্থন মিলতে পারে।

লেখক আরো বলেছেন :

> শুধু ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক দিয়েই নয়, কাব্যের ভাষায় মুসলমান কবিরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। [পৃ ৩৩৮]

এ মন্তব্য তিনি আর ব্যাখ্যা করেন নি, সুতরাং তা স্বীকার করা সহজ নয়। শাহাদাৎ হোসেন বা নজরুলের আগে কোন মুসলমান কবির নিজস্ব diction গড়ে উঠেছিল বলে আমার জানা নেই। লেখক যাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কায়কোবাদ নবীন সেনের অনুসারী ছিলেন। 'পলাশির যুদ্ধের' (১৮৭৬) তৃতীয় সর্গের প্রথম স্তবকের সরাসরি অনুকরণ 'মহাশ্মশানে' আছে দুবার. 'মহররম শরীফে' অন্ততঃ চারবার। হামিদ আলী মধুসূদনের অদৃষ্টবাদ আর নবীন সেনের ভাষাকেই অনুকরণ করেছেন। সিরাজীর 'স্পেন-বিজয়ে' 'মেঘনাদবধে'র অনুসরণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

ছয়

কাজী আবদুল মান্নানের 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' আমাদের সাহিত্যের সুসম্পূর্ণ ইতিহাস-রচনায় সাহায্য করবে এবং সেজন্যই এই বইয়ের প্রকাশকে আমরা অভিনন্দিত করি। তাঁর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সঙ্গে সর্বত্র একমত না হতে পারলেও, যে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করেছেন, সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তেমনি, তাঁর উদ্‌ঘাটিত তথ্যাদিও যথেষ্ট মূল্যবান। ঐ যুগের সাহিত্য সম্পর্কে যাঁরা আগ্রশীল, এ বই তাঁদেরকে আনন্দ দেবে এবং সেই সাহিত্য সম্পর্কে অনেকখানি স্বচ্ছ ধারণাদান করতেও সক্ষম হবে।

—আনিসুজ্জামান

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ॥ নদীয়া, জানুয়ারী ১৯৬২ ॥ প্রাপ্তিস্থান ঃ ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৮০ ॥ দাম ঃ চার টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা ॥

ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল 'উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস' নামে একটি নির্ভরযোগ্য ও সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। দুটি কারণে তিনি আমাদের প্রশংসাভাজন ঃ প্রথমতঃ, বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করলেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁর শিক্ষাপীঠের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এ বই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন।

উর্দু ভাষার উৎপত্তি থেকে শুরু করে 'রেখ্‌তা' কবিতা, এই ভাষার প্রস্তুতি পর্বে উত্তর ভারত, দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের অবদান, শেষ মুঘল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং এই ভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান রূপ পর্যন্ত তিনি আলোচনা করেছেন। গ্রন্থকারের শিক্ষক ডক্টর আন্দালীব শাদানীসহ উর্দু সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখকের ভূমিকাও তিনি উদ্ধৃতি-সহযোগে বর্ণনা করেছেন। উর্দু সাহিত্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভূমিকা এবং ইংরেজ সিভিলিয়ান ও পণ্ডিতদের অবদানের যথার্থ মূল্যও নিরূপিত হয়েছে। বইটির প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ সুবিন্যস্ত। বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে উর্দু গদ্যকাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষ পরিচ্ছেদে (পৃ ৩৭৩-৩৮৪) উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের অবদান বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকারের পরিবেশিত কয়েকটি তথ্য খুবই কৌতুহলোদ্দীপক ঃ হুগলীর কাজী মুহম্মদ সাদিক খান আখতার (মৃত্যু ১৮৫৬) অযোধ্যার নবাব গাজীউদ্দীন হায়দর কর্তৃক রাজকবি (মাকিউস-শুয়ারা) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন এবং ঢাকাবাসী নবাব সৈয়দ মুহম্মদ আজাদ (জন্ম ১৮৪৮) কাব্যরচনা ছাড়াও লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত 'আওয়াধ পাঞ্চ' ও 'আওয়াধ আখবার' পত্রিকা দুটি সম্পাদনা করতেন।

পাক-ভারত উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় ভাষারূপে উর্দুকে গ্রহণ করার জন্য ডক্টর পাল বলিষ্ঠভাবে দাবী জানিয়েছেন (পৃ ২৬)। বিশেষ করে এ কারণেই, উর্দু ভাষার উন্নয়নে ইউরোপীয় ও ইন্দো-ইউরোপীয়দের দান সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা করলে তিনি ভাল করতেন। এ বিষয়ে ডক্টর রামবাবু সাক্সেনা ইংরেজীতে বিপুলায়তন গ্রন্থ (European and Indo-European Poets of Urdu) প্রণয়ন করেছেন। আমার বিশ্বাস, এক্ষেত্রে অনেকের স্থানই খুব উচ্চে। উদাহরণস্বরূপ, মীরাটের ফ্রান্সিস কয়েন (তখল্লুস ঃ ফরসূ) শক্তিমান লেখক ছিলেন; তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর রচনাবলী এখটি কুল্লিয়াৎরূপে সংগৃহীত হয়েছে। আলওয়ারের ক্যাপ্টেন পীটার বেন্স্লেকে ডক্টর সাকসেনা একজন শ্রেষ্ঠ ইঙ্গ-ভারতীয় কবি বলে উল্লেখ করেছেন। সর্বোপরি, মীরাট ও আলীগড়বাসী জর্জ পোয়েশের (ছদ্মনাম ঃ শোর) নাম উল্লেখযোগ্য—তিনি মসনভীতে রচিত একটি অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং ফারসী ও উর্দুতে সম্পূর্ণ দীওয়ান রচনা করে গেছেন। এসব কথা যোগ করলে পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধারণ ভাষা হিসেবে উর্দুর সার্বজনীনতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠত।

আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে একটি 'নির্ঘণ্ট' যোগ করা হবে—এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের জন্য তা একান্তই অপরিহার্য।

—আবদুল হালীম